গুরুপ্রণতি

গুরুমূর্তি স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণা

শ্রীসারদা মঠে আমরা শাস্ত্রপাঠ করতে বসেছি পূজনীয়া সদাত্মপ্রাণাজীর কাছে, বেদান্তসার পড়া হচ্ছে। মঙ্গলাচরণের পরে গুরুপ্রণাম—''অর্থতোঽপ্যদ্বয়ানন্দানতীতদ্বৈতভানতঃ।/ গুরূনা-রাধ্য বেদান্তসারং বক্ষ্যে যথামতি॥'' যিনি অদ্বৈততত্ত্বে বিচরণ করে আনন্দে থাকেন সেই গুরুকে প্রণাম জানাচ্ছেন শিষ্য। এ-প্রসঙ্গে শ্রীগুরুতত্ত্ব আলোচনা করছিলেন মাতাজী। গুরুশক্তি এবং মন্ত্রশক্তি প্রসঙ্গে বললেন, ''শ্রীগুরু যখন শিষ্যকে মন্ত্রদীক্ষা দেন, তখন তৎক্ষণাৎ সেই মন্ত্রে আবির্ভূত হয় 'অপূর্ব'। মন্ত্রের শব্দগুলি তো আমাদের পরিচিত শব্দকোষ থেকে নেওয়া। কিন্তু 'অপূর্ব' সেই গুরুমুখাগত মন্ত্রে নিয়ে আসে অসাধারণত্ব। অপরিসীম শক্তিসম্পন্ন এই মন্ত্র সাধারণ জীবকে সমস্ত দুঃখ-শোক-যন্ত্রণার পারে নিয়ে গিয়ে ভববন্ধন ছিন্ন করে দিতে পারে। যিনি এই শক্তি ধারণ ও বিতরণ করেন, তিনি কখনই সাধারণ মানুষ হতে পারেন না। মায়াধীশের সন্ধান যিনি দিচ্ছেন তিনি স্বয়ং মায়াধীন কীভাবে হবেন? শ্রীগুরু সেই পরম শক্তিমানেরই সচল লীলাবিগ্রহ। তাই কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ''সচ্চিদানন্দই গুরুরূপে আসেন। মানুষ গুরুর কাছে যদি কেউ দীক্ষা লয়, তাঁকে মানুষ ভাবলে কিছু হবে না, তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবতে হয়, তবে তো মন্ত্রে বিশ্বাস হবে।'' প্রত্যক্ষই বিশ্বাসের জনক। আমরা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ পরম্পরায় শ্রীগুরুদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি ঈশ্বর ও গুরুর এই অতীন্দ্রিয় ঐক্য, অলৌকিক আবির্ভাব!

সময়টা সত্তরের দশক। আগরতলার একটি স্কুলপ্রাঙ্গণে ত্রিপল দিয়ে ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। বেলুড় মঠের দশম সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ এসেছেন গৃহস্থ-পরিচালিত একটি ছোট আশ্রমে। অকাতরে কৃপাদান করে চলেছেন ত্রিপুরাবাসীকে। উপজাতি অধ্যুষিত ত্রিপুরায় তাঁর বিশেষ কৃপাধন্য হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন আদিবাসী সম্প্রদায়। সেদিনের সেই সন্ধ্যায় আদিবাসী বালক-বালিকারা অত্যন্ত ঘরোয়াভাবে খোলা উঠোনে, হ্যাজাকের আলোয় মহারাজকে অনুষ্ঠান করে দেখাচ্ছিল। কতরকম নাচ, শারীরিক কৌশল, তাদের নিজস্ব ভাষায় গান—মহারাজও উপভোগ করছেন, আনন্দ করছেন, হাসছেন। সবশেষে তারা মহারাজের দিকে দুহাত বাড়িয়ে নেচে নেচে বাংলায় গান ধরল—''এসো রামকৃষ্ণ, এসো রামকৃষ্ণ—জগতের মানুষ তোমায় বরণ করে।''

গানটি শ্রীরামকৃষ্ণ সংগীত, কিন্তু তাদের নাচের এমন ভঙ্গিমা যেন তারা মহারাজকেই আবাহন করছে। মহারাজ আস্তে আস্তে গম্ভীর হয়ে গেলেন, আরক্তিম হয়ে উঠল মুখ। উচ্ছল পরিবেশ মুহূর্তে বদলে গেল এক অভূতপূর্ব ভাবগাম্ভীর্যে। যেন স্বামী বীরেশ্বরানন্দ-বিগ্রহে শ্রীরামকৃষ্ণকে আহ্বান করছে আদিবাসী কন্যারা, তাদের সংগীতে এক আন্তরিক সারল্য! মহারাজও আমাদের চোখের সামনে ভাবতন্ময়তার গভীরে ডুবে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে একাত্মতাবোধে প্রতিষ্ঠিত না হলে কি একটু উদ্দীপনায় মন এমনভাবে লীন হয়ে যেতে পারে?

এক ব্রহ্মচারিণী কন্যা একদিন বেলুড় মঠে মহারাজকে একটু অনুযোগের সুরে বলেছিলেন, ''আপনার এত সময় কোথায়? আপনার অসংখ্য শিষ্যশিষ্যা! আমার কিন্তু মাঝে মাঝেই সংশয় হয় আপনি কি সত্যসত্যই আমাদের মনে করেন?'' করুণায় দ্রবীভূত গুরু উত্তর দেন, ''তোমাদের কথা মনে থাকবে না কেন? সবসময় থাকে—তোমাদের যে আমি ঠাকুরের পায়ে দিয়েছি। আর কিছু জানাবার থাকলে মন্দিরে ঠাকুরকে জানাবে। আমি জানতে পারব।''

ঠাকুরের সঙ্গে এই ঐক্যবোধে সুপ্রতিষ্ঠিত স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ সঙ্ঘগুরুরূপে অগণিত মানুষকে আলোর পথে—ঈশ্বরের পথে নিয়ে গেছেন, আবার ঈশ্বরীয় করুণায় তাদের সব বিপদ-আপদ, দুঃখ-দুর্যোগ থেকে মাতৃস্নেহে আড়াল করেছেন। স্বামী সারদানন্দের মতে এটিকেই বলে গুরুভাব—নিজের আমিত্বকে ভুলে গিয়ে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া! এমনই সেই অভিন্নতা যাঁকে দেখলে মানুষের মনে হয়, ইনি কি শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং? নইলে এত শক্তি এবং প্রেম কোনও একজন মানবের শরীরে কীভাবে সম্ভব? শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে যেমন তাঁর পার্ষদেরা প্রত্যক্ষ করেছেন, কীভাবে তিনি তাঁর স্বাভাবিক বালকভাবকে সরিয়ে দিয়ে জগন্মাতার সঙ্গে একীভূত হয়ে ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকতেন, সেই একই ভাব পার্ষদেরা নিজেদের জীবনে প্রকাশ করেছেন এবং লোককল্যাণের জন্য সঙ্ঘাধ্যক্ষ পরম্পরায় প্রবাহিত করে দিয়েছেন। সে-কারণেই আমরা দশম অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের ছোটখাট দেহটির মধ্যে দেখতে পাই অলৌকিক গুরুশক্তির বিপুল প্রকাশ এবং প্রসার!

তিনি অধ্যাত্মজগতের শিক্ষক, যাঁর পাঠদান প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে আছে একটি অতিশক্তিশালী বীজমন্ত্র এবং তার অনুশীলন পদ্ধতি। মহারাজকে আমরা দেখেছি বারে বারে এই মন্ত্রজপের প্রয়োজনীয়তা যেমন শেখাচ্ছেন, তেমনি শেখাচ্ছেন তার প্রণালী। কোনও সন্তানকে লিখছেন, ''মনে মনে সারাদিন মন্ত্র জপ করবে। কোনও সন্দেহ নেই যে, যখন তখন মন অন্যত্র চলে যাবে ও মন্ত্র জপ করতে ভুলে যাবে। কিন্তু যেই সে-বিষয়ে তোমার হুঁশ ফিরবে অমনি আবার জপ করতে আরম্ভ করে দেবে ও এভাবে সর্বদা জপ করতে পারবে। যখন ধ্যান করবে তখন শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রেম, পবিত্রতা, আনন্দ ইত্যাদির মূর্তরূপ হিসাবে ভাববে এবং দেখবে যে সমস্ত ঈর্ষা, ঘৃণা ইত্যাদি তোমার মন থেকে অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে।''

কোনও শিষ্যের জিভ না নাড়িয়ে জপ করতে অসুবিধা হচ্ছে, তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছেন, ''আপাতত জপ করার সময় ঠোঁট না নাড়িয়ে শুধু জিভ চালনা করে নিঃশব্দে জপ করতে পার। কিন্তু জিভ ও ঠোঁট না নাড়িয়ে জপ করার অভ্যাস করতে চেষ্টা করো। ক্রমাগত চেষ্টা করলে, নিজের অন্তঃস্থল থেকে মন্ত্রোচ্চারণ করতে পারবে, একটিও পেশি না নাড়িয়েই।''

মন্ত্রের সংখ্যা রাখা নিয়ে কারও সমস্যা হচ্ছে। তাকে মহারাজ পরামর্শ দিচ্ছেন, ''তোমাকে যেমন

বলেছি একশো আট বার করে জপ করে ডান হাত বা বাঁ হাত কোনও হাতেই আর সংখ্যা রেখে জপ করতে হবে না। একাসনে বেশিক্ষণ বসতে কষ্ট হলে উঠে পড়বে এবং কাজকর্ম চলাফেরার মধ্যে স্মরণ-মনন ও মনে মনে জপ করবে।"

জপের সময় ঘুম আসা বহুজনেরই অভিজ্ঞতা। মিশন বিভাগে সারাদিন বিশ্রামহীন কাজের পরে অনেক সাধু-ব্রহ্মচারীরই জপ করতে বসে ক্লান্তিতে ঘুম চলে আসে। মহারাজ কিন্তু যে-কোনও ক্ষেত্রেই জপধ্যানের ব্যাপারে আপসহীন। বলছেন, ''জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলবে। ঘুম থেকে উঠে একটু কিছু ব্যায়াম করবে। তারপর তাজা শরীর ও মন নিয়ে জপে বসবে। তাহলে আর ঘুম পাবে না।" এক সন্ন্যাসিনী শিষ্যাকে এই একই প্রসঙ্গে বলছেন, ''শরীর শরীরের ধর্ম করছে। শরীরকে কোনও ইম্পর্ট্যান্স দেবে না। এরকম হলে চোখে-মুখে জল দিয়ে কোনও বড়কে বলে ছাদে জপ করতে চলে যাবে। সব ঘুম চলে যাবে। Every minute কাজের মধ্যেও জপ করে যাবে।... একদিন দেখবে তোমার অলক্ষ্যে মনের একটা অংশ জপ করে চলেছে।"

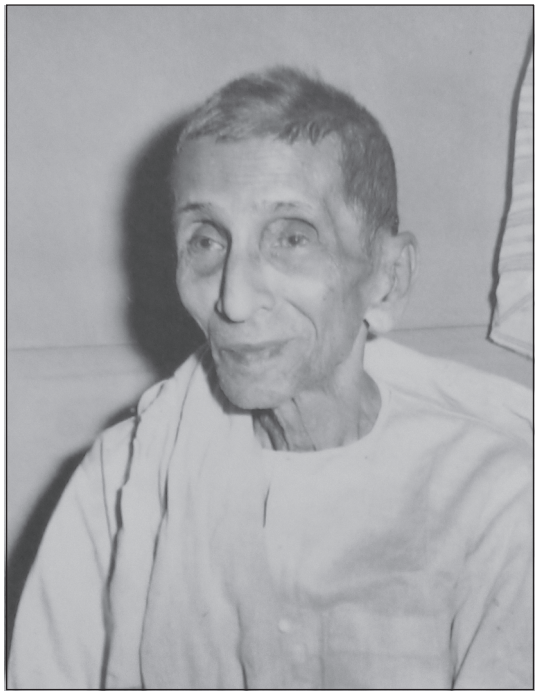

অধ্যাত্মসাধনায় সব থেকে বেশি প্রয়োজন নিষ্ঠা। জপে একাগ্রতার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হল ইষ্টনিষ্ঠা, সময়নিষ্ঠা, স্থাননিষ্ঠা এবং আসননিষ্ঠা। মহারাজ নির্দিষ্ট সময়ে জপ করার ক্ষেত্রে যেমন জোর দিয়েছেন, তেমনই জপের নির্দিষ্ট আসন ব্যবহারের বিষয়টিতেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। একবার তাঁর দীক্ষিত একটি ছাত্রী এসেছে কলকাতায় হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করতে। জপের আসনটি আর গুছিয়ে আনা হয়নি। সে ভাবল, ''মহারাজকে জানিয়ে রাখি, এই কটা দিন আসন ছাড়াই জপ করতে হবে।" সদ্য মাধ্যমিক-উত্তীর্ণ কিশোরী মেয়েটি পরের দিনই গেল বেলুড় মঠে। মহারাজ কিন্তু সব শুনে নিজের কাছ থেকে একটা আসন তাকে দিলেন। অর্থাৎ তাকে একটি নির্দিষ্ট আসনে বসে, শুদ্ধাচারে, মহারাজের নির্দেশমতো নিত্যকর্মের জপটুকু করতেই হবে। মহারাজ একবারও বললেন না, ''ঠিক আছে, পরেরবার বাড়ি থেকে নিয়ে আসবি।" বরং একটা চকমকে কাঁচ বসানো আসন দিয়ে হেসে বললেন, ''দ্যাখ তো, কার আসনটা বেশি সুন্দর?" দীক্ষিত সন্তানদের সাধনার গতিকে এভাবেই তিনি অত্যন্ত সহজভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

মন্ত্রজপের ক্ষেত্রে উচ্চারণেরও একটা ভূমিকা থাকে। যদিও আমরা গল্প জানি যে, কোনও এক মহিলা 'রুক্মিণীনাথায়' মন্ত্রে দীক্ষিত হলেও মন্ত্র ভুলে গিয়ে 'রুকু' 'রুকু' জপ করেই সিদ্ধিলাভ করেন, কিন্তু মহারাজ ছিলেন উত্তম বৈদ্য। তিনি বিশুদ্ধ উচ্চারণের ওপর খুব গুরুত্ব দিতেন। দীক্ষা-শেষে দীক্ষার্থীরা তাঁকে মন্ত্রোচ্চারণ করে শোনাত

এবং করগণনাও দেখিয়ে যেত। একবার মালদায় এক বৃদ্ধা কিছুতেই মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে পারছেন না। তাঁর কন্যাও মহারাজের দীক্ষিত। মহারাজ মাকে মন্ত্র অভ্যাস করিয়ে দেওয়ার ভার দিলেন মেয়ের ওপর। অবশেষে বহু অভ্যাসের পর মহারাজকে সঠিক করগণনা দেখিয়ে এবং শুদ্ধ উচ্চারণ শুনিয়ে তবেই ভদ্রমহিলার বাড়ি ফিরে যাওয়ার অনুমতি মিলল।

সিদ্ধ মহাপুরুষের জীবনে লৌকিক-অলৌকিকের কোনও পার্থক্য থাকে না। আমাদের বোধের অক্ষমতায় যেগুলিকে অলৌকিক মনে হয়, অতীন্দ্রিয় জগতে অনায়াসে বিচরণশীল এইসব মহাপুরুষের কাছে সেটাও লৌকিক। অমৃতসরের এক দম্পতি মহারাজের কাছে দীক্ষা নিয়ে গেছেন। দীক্ষার সময় মহিলা বোধহয় খুব একটা সমনস্ক ছিলেন না। বাড়ি ফিরে তিনি জপ করছেন, কিন্তু মন অশান্ত হয়ে আছে। তারপরেই তিনি পরপর তিনদিন একই স্বপ্ন দেখলেন, মহারাজ যেন তাঁকে বলছেন, ''তুমি ভুল জপ করছ।'' তিনি সব জানিয়ে, নিজের বর্তমান মন্ত্রটিও লিখে মহারাজকে চিঠি দিলেন। মহারাজ তাঁর অশুদ্ধ মন্ত্র সংশোধন করে চিঠির উত্তর দেন। নিষ্ঠাভরে সেই মন্ত্র কিছুদিন জপ করার পরই তাঁর মনের অশান্তি একেবারে চলে গেল।

১৯৮৪-তে এক ভয়াবহ বন্যায় বিহার সরকারের অনুরোধে রামকৃষ্ণ মিশন সেখানে ত্রাণকাজে যায়। যে-সন্ন্যাসীরা এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলে সেখানকার এক সরকারি অধিকর্তার খুব ভাল লাগে এবং ক্রমে মন্ত্রদীক্ষা নেওয়ার সদিচ্ছা মনে জেগে ওঠে। সাধুরা ফিরে এসে তাঁর কথা প্রেসিডেন্ট মহারাজকে জানান। পূজনীয় মহারাজ তাঁকে কৃপা করে দীক্ষার অনুমতি দিলেন। দীক্ষার পর তাঁকে আরও কয়েকদিন মঠে থেকে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল কিন্তু কর্মক্ষেত্রে দায়িত্বের চাপে তাঁকে ফিরে যেতে হয়। তিনি বলে যান যে তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেলুড় মঠে এসে কয়েকদিন গুরুদর্শনের জন্য থেকে যাবেন। কিন্তু সেটাই ছিল মহারাজের শেষ দীক্ষাদান। এর কিছুদিন পরই তিনি দেহরক্ষা করেন। ভদ্রলোক মহারাজের মহাসমাধির খবর শুনে অনুতাপে, দুঃখে বিহ্বল হয়ে পড়েন—কেন তিনি আর কয়েকটি দিন সাধুরা বলা সত্ত্বেও বেলুড় মঠে থেকে এলেন না! কেঁদে কেঁদে তাঁর রাত কেটে যায়। ভোর তিনটের সময় পরিচিত এক সাধুকে মনের ব্যথা জানিয়ে চিঠি লেখেন। সাধু চিঠিটি পেয়ে ভাবছেন সান্ত্বনা জানিয়ে চিঠি দেবেন, তখনই আসে দ্বিতীয় চিঠি। ভদ্রলোক লিখেছেন, তিনি শেষ রাতে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছেন, তখনই দেখলেন এক দিব্যজ্যোতিতে চারদিক আলোকময়। পূজনীয় মহারাজ সম্পূর্ণ সুস্থ ও জ্যোতির্ময় দেহে তাঁর দিকে এগিয়ে এসে হাত তুলে বলছেন, ''তুমি কেন এত কাঁদছ? দীক্ষার সময় আমি যা বলেছি সেরকম করো আর মন্ত্র জপ করো। যখন দরকার হবে, তখন আমি আবার তোমাকে বলব কী করতে হবে।''

আমরা দেখতে পাই যে এই একই অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে মহারাজ পবিত্র দীক্ষার অনুষ্ঠানে কোনওরকম অনৈতিকতাকে প্রবেশ করতে দেননি। একবার শিলচরে তিনশো জনের দীক্ষা হবে। সকলে ফর্ম ফিলাপ করে ঘরে বসেছেন। মহারাজ কিন্তু ঘরে ঢুকেই বললেন, ''কেউ যদি আগে দীক্ষা নিয়ে থাক তাহলে উঠে চলে যাও।'' কেউ যখন বার বার বলা সত্ত্বেও উঠল না তখন মহারাজ রামগোপাল মহারাজকে বললেন জানিয়ে দিতে যে সেদিন কারুরই দীক্ষা হবে না। তখন রামগোপাল মহারাজ হাতজোড় করে দীক্ষার্থীদের কাতরভাবে অনুরোধ করলেন। তাতে এক মাঝবয়সী মহিলা উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যান। পরে জানা যায় যে সেই মহিলা দু-তিন জায়গায় দীক্ষা নিয়েছেন। এখানে

কীভাবে দীক্ষামন্ত্র দেওয়া হয় তা জানার জন্য মিথ্যাভাবে দীক্ষাফর্ম ভরে দলের সঙ্গে এসেছিলেন। মহারাজের জীবনে এমন ঘটনা আরও ঘটেছিল।

অসামান্য গুরুশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত মহারাজ কিন্তু কোনও তাৎক্ষণিক ভাবাবেগকে ধর্মীয় অনুভূতির সঙ্গে মিলিয়ে ফেলার প্রবণতা থেকে সতর্ক করতেন। স্বপ্নে দেবদেবী দর্শনকে তিনি কখনও গুরুত্ব দেননি। তাঁর বক্তব্য ছিল, স্বপ্নে প্রকৃত দর্শন বিরল। যদি এই দর্শন দ্রষ্টার জীবনকে পরিবর্তিত করে দেয় তাহলেই কেবল একে আধ্যাত্মিক উন্নতির একটা লক্ষণ বলা যেতে পারে। না হলে এসব স্বপ্নের কোনও গুরুত্ব নেই। তবে জাগতিক স্বপ্ন দেখার চেয়ে দেবদেবীর স্বপ্ন দেখা ভাল। আমাদের অবচেতন মনও যে শুদ্ধ হচ্ছে এ তারই প্রকাশ।

কোনও শিষ্য হয়তো তাঁকে আগ্রহভরে নিজের মেরুদণ্ডের শিহরন ইত্যাদি ব্যাপারে কিছু জানিয়েছেন। মহারাজ কিন্তু তাঁকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। এসব ভাবাবেগকে আধ্যাত্মিক অনুভূতি মনে করলে সত্যকারের অগ্রগতি থেমে যায়।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একটি বৈশিষ্ট্য, এখানে সঙ্ঘাধ্যক্ষ গুরু শেখান যে গুরু এক শ্রীরামকৃষ্ণ। মহারাজ সেজন্য তাঁর জীবদ্দশায় নিজের জন্মদিনটি কখনও কাউকে জানাননি, বরং এই উদ্দেশ্যে সকলকে গুরুপূর্ণিমা পালন করতে বলেছিলেন। আধ্যাত্মিক সঙ্ঘকে সঠিক দিশায় পরিচালনা তাঁর গুরুশক্তিরই এক প্রসারিত রূপ। স্বামীজীর আদর্শ তাঁর নিজের প্রাত্যহিক জীবনচর্যায় ও উপদেশে বারে বারে প্রকাশ পেত। কোনও এক শিষ্যাকে বলছেন, ''এই কথাটা মনে রাখবে—কাজটা জপধ্যানের লেভেল-এ তুলতে হবে। স্বামীজীর কর্মযোগের এটাই ideal। কাজটাকে জপধ্যানের বাধা বলে মনে করলে, নিজেরাই আনন্দ পাবে না।... ধ্যান মানে হচ্ছে—ভগবানের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন মনের যোগ। কাজের মধ্য দিয়েও সেটাই করতে হবে। এটাই স্বামীজীর ideal।'' জপধ্যানে তিনি সবসময় জোর দিতেন কিন্তু আবার বলতেন, ''কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে বিচার করো। চোখ বন্ধ করে মনকে একাগ্র করছ ভাল কথা, কিন্তু কাজের সময় মনের একাগ্রতা কতটুকু? পাহাড়ের গুহায় নিঃসঙ্গ হয়ে থাকা সহজ, কিন্তু হাজার মানুষের মধ্যে নিজের মনকে নিঃসঙ্গ রাখতে পার কি?'' গুরুর জীবন শিষ্যকে পথ দেখায়। আমরা স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর জীবনে দেখতে পাই কর্ম এবং ধ্যানের এক সুসমঞ্জস সমাহার।

তাঁর একান্ত সেবক একদিন বিকেলে তাঁকে প্রণাম করতে গেছেন। খুব হট্টগোল হচ্ছে চতুর্দিকে। সেবক মহারাজ গিয়ে দেখলেন প্রেসিডেন্ট মহারাজ তন্ময় হয়ে জপ করছেন। মিনিট পাঁচেক আগে এক ভক্ত পরিবার প্রণাম করতে এসেছিল। তাদের সঙ্গে তিনি কথাও বলেছেন। কিন্তু এই অল্পসময়ের মধ্যেই কোন অন্তর্লোকে আবার ডুবে আছেন। তাঁকে ডাকার সাহস হল না, এভাবেই কেটে যায় দশ মিনিট। পরে সেবকের পায়ের শব্দে মহারাজ সচেতন হন। কাজকে কীভাবে পূজায় পরিণত করা যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলতেন, ''সর্বদা স্মরণ-মনন রাখো, যতটুকু পার ইষ্টমন্ত্র জপ করো এবং যে-কাজই কর প্রারম্ভে ও সমাপ্তিতে ভগবানকে সমর্পণ করে দাও।'' হাজার মানুষের মধ্যেও মনকে কীভাবে নিঃসঙ্গ রাখা যায় তার প্রক্রিয়া যেমন বলেছেন, তেমনি নিজের জীবনে উদাহরণটিও দেখিয়ে গেছেন বারে বারে। গভীর রাতে দেখা গেছে তিনি টর্চ জ্বালিয়ে, প্রয়োজনে দুটি টর্চ জ্বালিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের মুখ দেখার চেষ্টা করছেন। তাঁর জীবনে সঙ্ঘের কাজ, জপধ্যানতন্ময়তা বা অবিচ্ছিন্নধারায় ঈশ্বরচিন্তন—এসবের মধ্যে কোনও ফারাক ছিল না।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে গুরুর স্বরূপ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—যিনি সৃষ্টির আদিতে হিরণ্যগর্ভকে উৎপাদন করেছিলেন এবং তাঁর উদ্দেশে যিনি বেদসকলকে প্রকাশ করেছিলেন, আমি মুক্তিমাত্র কামনা করে আত্মবুদ্ধির প্রকাশক সেই জ্যোতির্ময়ের শরণ গ্রহণ করছি। 'বেদান্তসার' গ্রন্থে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞত্ব, অন্তর্যামিত্ব ইত্যাদি গুণে ভূষিত বলা হয়েছে। মানবশরীরী গুরুর মধ্যেও আমরা এই একই সর্বজ্ঞত্ব, অন্তর্যামিত্ব গুণগুলি দেখতে পাই।

গুসকরা গ্রামের রাখহরি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে সদ্‌বাসনা এবং বৈরাগ্য জেগে উঠেছে। তিনি সঙ্ঘে যোগ দিয়ে সন্ন্যাসী হতে চান। তাঁর গুরু বেলুড় মঠের দশম প্রেসিডেন্ট। মহারাজ কিন্তু তাঁকে অন্য নির্দেশ দিলেন। তাঁর নিজের গ্রামে ঠাকুর, মা, স্বামীজীর ভাবাদর্শে একটা ছোট প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে বললেন। পড়াশোনা শেষ হওয়ার পরেও কিছুতেই তাঁকে সঙ্ঘে যোগ দেওয়ার অনুমতি দিলেন না। অভিমানে রাখহরি মঠে আসা বন্ধ করে দিলেন। একদিন রেডিওতে গুরুদেবের দেহত্যাগের খবর শুনতে পেলেন। অনুশোচনায় তখন নিজের ওপরেই ধিক্কার এল তাঁর। প্রবল মনস্তাপে গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে গ্রামসেবাতে সম্পূর্ণ মন দিলেন রাখহরি। ক্রমে এই প্রতিষ্ঠান বিরাট আকার ধারণ করে এবং তাঁর পরিচালনায় গ্রামে গ্রামে সেবাকার্যের বহু প্রসার হতে থাকে। পরবর্তী সময়ে তিনি বলেছেন, ''এখন বুঝতে পারছি কেন গুরুদেব আমাকে বেলুড় মঠে যোগ দিতে বলেননি।''

মহারাজের আর এক সন্তানেরও বড় ইচ্ছা সাধু হবে। মহারাজের কাছে গেছে অনুমতি প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তার আগেই একটি ছেলে ওই একই প্রার্থনা নিয়ে মহারাজের কাছে গিয়েছিল, মহারাজ তাকে বারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং ইতস্তত মনে সে মহারাজকে প্রণাম করে। সে এসেছে বেলুড় মঠে দীক্ষা নিয়ে তিনরাত গুরুস্থানে বাস করতে। তিনদিন তিনরাত কেটে গেছে, এবারে ফিরে যেতে হবে। মহারাজ নিজের থেকেই প্রশ্ন করলেন, ''ফিরে গিয়ে কী করবে?'' দুরুদুরু বুকে সে উত্তর করল, ''আপনি যা আদেশ করবেন।'' অন্তর্যামী মহারাজ আদেশ করলেন, ''গিয়ে আশ্রমে থাকবে সাধু হয়ে।''

শিষ্যদের ভূত-ভবিষ্যৎ, ভালমন্দ সব ছিল তাঁর কাছে যেন একটি খোলা পৃষ্ঠার মতন।

এলাহাবাদের এক খোঁড়া বেহালাবাদক রামনামের সময় বেহালা বাজাতেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের কাছে তিনি দীক্ষা প্রার্থনা করেছিলেন, স্বামী শংকরানন্দের কাছেও দীক্ষা প্রার্থনা করেন, কিন্তু প্রতিবারই তাঁর প্রস্তাব খারিজ হয়ে যায়। বহুদিন কেটে গেছে। স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ যখন প্রেসিডেন্ট হন তখন তিনি আবার দীক্ষার আবেদন করলেন। কিন্তু এবারেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। তাঁকে বারণ করে দেওয়া হল। অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে তিনি প্রেসিডেন্ট মহারাজকে বললেন, ''আমারও তো বয়স হল, আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে?'' মহারাজ বললেন, ''আমি দীক্ষা দিতে পারি; কিন্তু দীক্ষা নেওয়ার একমাসের মধ্যে তোমার শরীর চলে যাবে, সেজন্য বাড়ি থেকে অনুমতি নিয়ে এসো।'' বৃদ্ধ বেহালাবাদকের দীক্ষা হয় এবং সত্যিই একমাসের মধ্যে তাঁর শরীর চলে যায়।

শ্রীগুরু প্রসঙ্গে বিবেকচূড়ামণিতে বলা হয়েছে, ''অহেতুকদয়াসিন্ধুর্বন্ধুরানমতাং সতাম্''—তিনি অহেতুক কৃপাসিন্ধু, প্রণত সজ্জন ব্যক্তিদের বন্ধু। ঈশ্বরলাভের পথ সম্পর্কে যুগযুগান্তরের সতর্কবার্তা—''ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।'' অধ্যাত্মজীবনের উপলবন্ধুর পথের যাত্রী এক ব্রহ্মচারী, তার গুরু বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের কাছে খুব দুঃখের সঙ্গে নিবেদন করেছিল মনের গভীর বিষাদের কথা। সে অবসাদে

ডুবে যাচ্ছে। সব কথা মহারাজ মন দিয়ে শুনলেন। তারপর খুব যত্নে তাকে বোঝালেন—''মনের স্বভাবই এই। এর জন্য মোটেই ভাববে না। ঠাকুর প্রার্থনা শুনবেন কি না সেটা তাঁর ব্যাপার। তুমি ডেকে যাও। ডাকা বাদ দেবে না।... তুমি তাঁর কৃপা চাইছ। তুমি তাঁর কৃপা পাবে।'' মহারাজের সেই আশ্বাস ব্রহ্মচারীকে এমনভাবে স্পর্শ করেছিল যে তার চোখ জলে ভিজে যায়। মহারাজ তার মাথায় হাত দিয়ে বলেন, ''আশীর্বাদ করছি, তুমি এইভাবে ডেকে যাও। কোনও চিন্তা করবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'' নিঃসন্দেহে সেই অমোঘ আশীর্বাদ শিষ্যের জীবনের গতি ফিরিয়ে দিয়েছিল।

একবার এক সাধু আশ্রমের কোনও মনোমালিন্যে মনের দুঃখে ঠিক করেছেন সঙ্ঘ ছেড়ে চলে যাবেন। গুরুদেবকে সব কিছু জানানো উচিত এই বোধে তিনি মহারাজের কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে নিজের মনোবেদনার কথা জানালেন। মহারাজের ছোট্ট শরীরে এল এক অদ্ভুত রূপান্তর। সাধুটি দেখলেন যেন এক প্রচণ্ড ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশে, গভীর স্নেহ ও করুণায় তাঁর সমস্ত শরীর লাল হয়ে গেছে। শিষ্যের বুক চিরে তাঁর আশীর্বাদের কথাগুলি প্রবেশ করতে শুরু করল—''চলে যাবে কেন, adjust, adjust, adjust.'' ওই কটি কথায় সাধুর মনের সব ভার লাঘব হয়ে গেল এবং তিনি নিশ্চিন্তে, পরম প্রশান্তিতে ফিরে গেলেন আশ্রমে।

এই একইরকম আর একটি ঘটনায় দেখি অন্তর্যামী শ্রীগুরু কীভাবে শিষ্যকে রক্ষা করছেন। একইরকম মানসিক দুর্যোগে এক সন্ন্যাসী মনে মনে স্থির করলেন যে তিনি সঙ্ঘত্যাগ করবেন। মহারাজকে মুখে কিছু জানালেন না, শুধু ভিড়ের মধ্যে তাঁকে প্রণাম করে চলে যাবেন স্থির করলেন। সময়টি বেছে নিলেন এমন একদিন যেদিন মহারাজ প্লেনে দিল্লি যাত্রা করবেন। সাধুটি এয়ারপোর্ট পর্যন্ত গেছেন। মহারাজ বিমানে ওঠার জন্য যখন ভিতরে চলে যাচ্ছেন তখন অনেকে তাঁকে প্রণাম করতে শুরু করল। সেই ভিড়ে তিনিও মহারাজের পাদস্পর্শ করে মনে মনে বললেন, ''এই আমার শেষ প্রণাম, আর দেখা হবে না।'' মনে এই চিন্তা করে মহারাজের চরণে হাত রাখা মাত্র তিনি জোরে বলে উঠলেন, ''বাড়িতে বাবা-কাকা যদি বকে, কোনও একটি কাজ করতে বাধা দেয়, তখন কি বাড়ি ছেড়ে চলে যায়! একটু বকেছেন, কাজটি ভালমন্দ বিচার করে করার কথা বলেছেন, অমনি রাগ হল। এতদিন খাইয়ে-পরিয়ে, শিক্ষা দিয়ে বড় করা হল, আর যখন তোমার কিছু দেওয়ার সময় এল তখন তুমি ছেড়ে চলে যাবে!'' সাধুটি তো অবাক হয়ে ঠকঠক করে কাঁপছেন, আর অন্যরা কিছুই বুঝতে না পেরে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন। মহারাজ আদেশের সুরে বললেন, ''আমি না বলা পর্যন্ত কোথাও যাবে না, যেখানে আছ সেখানেই থাকবে।'' পরে অশ্রুসজল চোখে সন্ন্যাসী স্মৃতিরোমন্থন করে বলতেন, ''আর আমি কোথাও যাব না। প্রভুর দরজায় কুকুরের মতো পড়ে থাকব।''

তাঁর এই অহেতুকী করুণা গৃহী-সন্ন্যাসী নির্বিশেষে, তাঁর দীক্ষিত শিষ্য বা অদীক্ষিত নির্বিশেষে দুকূল প্লাবিত করে বয়ে চলেছিল। দীনজনে যেন তাঁর করুণার প্রকাশ ছিল বেশি। এক বিধবা গ্রাম থেকে এসেছেন। তাঁর আঁচলের খুঁটে ছোট্ট একটা প্যাকেটে একটু চা-পাতা। প্রণাম চলছে। মহারাজ বৃদ্ধাকে পাশে বসতে বললেন এবং হরলাল মহারাজকে বললেন তাড়াতাড়ি এককাপ চা বানিয়ে আনতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চা তৈরি হয়ে এল। মহারাজ পরম তৃপ্তিতে সেই চায়ে চুমুক দিলেন আর বৃদ্ধার দুগাল বেয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

এই করুণার প্রকাশেই তাঁর অনুপ্রেরণায় পল্লিমঙ্গল ইত্যাদি গ্রামসেবার কত প্রতিষ্ঠান গড়ে

উঠেছিল। এসব কাজ সাধনার অন্যতম মাধ্যম এবং ভগবান লাভের উপায়—এই মর্মে তিনি সন্তানদের উৎসাহিত করতেন। এক সন্তানকে তিনি বলছেন, ''আমার জন্য সব থেকে সেরা যে কাজটা করতে পার তা হল যেমনভাবে বলা হয়েছে তেমনভাবে জপ ও ধ্যান নিয়মিত করে যাওয়া।'' আবার এক সন্তান, যিনি কিনা পল্লিমঙ্গলের বহু কাজ করেছেন, তাঁর পুত্রবধূকে লক্ষ করে মহারাজ বলছেন, ''ও আমার কত সেবা করেছে, এখন পল্লিমঙ্গল নিয়েও আমার সেবা করছে।'' ঈশ্বর-আরাধনা বোধে মানবকল্যাণের কাজ এবং জপধ্যান দুটিকেই তিনি সমান গুরুত্ব দিয়ে গেছেন। একদিন বহুক্ষণ ভক্তদের প্রণাম নিয়ে তিনি নিজের ঘরে গেছেন। সেবক মহারাজ বিনীতভাবে জানতে চাইলেন, দরজাটা বন্ধ করে দেবেন কি না, মহারাজ হয়তো জপ করবেন। মহারাজ হেসে উত্তর দিলেন, ''হ্যাঁ তুমি তা করতে পার। কিন্তু তুমি কি ভাবছ—আমি এতক্ষণ কুটনো কুটছিলাম! প্রত্যেক ভক্তই রামকৃষ্ণের আকার, আমি মনে মনে প্রত্যেকের কাছে নত হচ্ছিলাম।''

সারদা মঠের কিছু সন্ন্যাসিনী গেছেন মহরাজের কাছে। শুভ্রাপ্রাণামাতাজী অনুযোগ করছেন—কতদিন হয়ে গেল সেরকম কিছু অনুভূতি তো হচ্ছে না! মহারাজ প্রথমেই কৌতুক করে জিজ্ঞাসা করলেন জানা থাকা সত্ত্বেও—''তুমি কার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছ?'' শুভ্রাপ্রাণাজী আবার অনুযোগ করে বললেন, ''আপনি যেন জানেন না'', তারপর গুরুর নাম বললেন। আবার মহারাজের প্রশ্ন, ''তিনি কার শিষ্য?'' ''শ্রীশ্রীমায়ের।'' এবারে মহারাজ গম্ভীর হয়ে বললেন, ''জেনে রাখো, তোমরা উদ্ধার হয়েই গেছ। তোমরা শ্রীশ্রীমায়ের সন্তানের শিষ্য।''

একবার মহারাজকে এক সন্ন্যাসী প্রশ্ন করেন, ''ঠাকুর ও মা এক এবং অভেদ। আপনারা মায়ের শিষ্য এবং আমরা আপনাদের শিষ্য। অতএব আপনারা যাঁদের দীক্ষা দিচ্ছেন তাঁদের উদ্ধার করার দায়িত্ব মায়েরই নয় কি?'' অস্বীকার করলেন না মহারাজ।

এক ব্রহ্মচারী শিষ্য দুর্গাপূজার সময়ে সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি না দেখে এসেছে গুরুকে প্রণাম করতে। মহারাজ হুঁকো খাচ্ছেন। শিষ্য হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করলেন, ''মহারাজ আশীর্বাদ করুন।'' মহারাজ ধীরে হুঁকোটা নামিয়ে মাথায় হাত রাখলেন। ব্রহ্মচারী পরে লিখছেন, ''যেই হাত রাখা, যেমন সুইচ টিপলে বিদ্যুৎপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে ওঠে, তেমনই আমার হৃদয়ে ইষ্টদেবতার মূর্তি ফুটে উঠল।''

এইভাবে 'তৎপদং দর্শিতং যেন'—যিনি সেই শ্রেয়ঃপদকে প্রত্যক্ষ করান তিনিই গুরু—যিনি পরমপদের সন্ধান দেন তিনিই গুরু। মাতৃগতপ্রাণ শ্রীশ্রীমায়ের সন্তান পরম পূজ্যপাদ বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ তাঁর গুরুভাবে এক বিরাট বটবৃক্ষের ছায়ায় কত সন্তপ্ত মানুষকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। স্পর্শমাত্র মুক্ত করে দেওয়া, স্পর্শেই শিষ্যের সব কলুষ হরণ করে তাকে ইষ্টদর্শন করিয়ে দেওয়ার অলৌকিক ক্ষমতায় বলীয়ান মহারাজ তাঁর অগণিত শিষ্যসন্ততিকে নিয়ে চলেছিলেন আলোর রাজ্যে। তাদের হাজার বছরের অন্ধকার একটিমাত্র শুভস্পর্শে, মহামন্ত্রে হয়ে উঠেছিল আলোকোজ্জ্বল। এখনও সেই একই শক্তি প্রার্থনাপর শিষ্যের সব বিপদ-বাধা নিঃশেষে দূর করে চলেছে। আলোয় আলোকময় করে আলোর আলো আসেন শ্রীগুরুরূপে। অন্ধ আঁখি দৃষ্টি ফিরে পায়—লক্ষ কোটি নয়নের আঁধার দূর হয়।

''অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥''